দৈনিক খবর

তারিখ ... 17 AUG 1991 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের

।। ডঃ মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম

সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্তি এবং অচলাবস্থার উপরে এক সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বের হয়েছে। সাধারণতঃ এ ধরনের কমিশনের রিপোর্ট জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয় না। তাই এই বিশেষ রিপোর্টটি প্রকাশ একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন এবং শিক্ষকদের আচার-আচরণের উপর কিছু অসাধারণ মন্তব্যের কারণেও রিপোর্টটি ব্যতিক্রমধর্মী।

বাংলাদেশের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়েই কিছুদিন পর পর ছাত্র অশান্তির কারণে পড়াশুনাসহ অন্যান্য একাডেমিক কাজকর্মের যে ব্যাঘাত ঘটে সে সম্বন্ধে নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। এ অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নানা সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতার বলয়ে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোর নিজেদের তথা নিজ নিজ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখার প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব। দেশের অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তি এবং অচলাবস্থা মূলতঃ ছাত্রদের মধ্যে বিরাজমান ব্যাপক শৃঙ্খলাহীনতা এবং পরস্পর বিবদমান ছাত্রদলগুলোর মধ্যে প্রচন্ড রকম বিরোধের ফল। চট্টগ্রামে শিবিরের রেকর্ড এ ব্যাপারে অতুলনীয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগঠিত অসংখ্য তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য বহন করবে। এ সমস্ত তদন্ত কমিটি সিন্ডিকেট কর্তৃক নিয়োজিত প্রবীণ শিক্ষকদের দ্বারাই গঠিত হয়ে থাকে এবং এর কার্য প্রণালী অনেকটা Quasi judicial চরিত্রের।

বৃহত্তর ছাত্র সমাজের মধ্যে শিবির সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব যে বিরাজমান তা গত চাকসু নির্বাচনের ফলাফল থেকেই বুঝা যায়। কিন্তু নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরও শিবির কেন প্রবল শক্তি হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়ে গেছে তার কারণ হল খুবই সংগঠিত এবং জঙ্গী মনোভাবসম্পন্ন ১৫০/২০০ ছাত্রের একটি দল শিবিরের Hard core হিসেবে কাজ করে। ফলে অনেকটা আধা সামরিক কায়দায় সংগঠিত এই জঙ্গীদের সামনে অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো টিকতে পারে না।

তাদের এই জঙ্গী মনোভাবের প্রথম সহিংস বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বরে। সেদিন তারা জাতীয় পার্টির অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদলটির একজন নেতার হাত কেটে তরবারির মাথায় ঝুলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিজয় মিছিল বের করে। সেই ত্রাস এবং মিছিল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দখলদারীর সূত্রপাত ঘটে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং একাডেমিক ব্যাপারে তারা অন্য সংগঠনগুলোকে মাথা তুলতে দেয়নি। এমনকি নির্বাচিত চাকসু এবং সর্বদলীয় আপসু নেতৃবৃন্দও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্বাধীনভাবে কোন কাজকর্ম করতে পারেনি। ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনার ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় চার মাস বন্ধ থাকার পর খোলা হলে শিবিরই ক্যাম্পাস এবং হলগুলো দখল করে নেয়। চাকসু এবং আপসু বিশ্ববিদ্যালয় গেইটের বহুদূরে মিছিল-মিটিং করে ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেনি।

তারও আগে ৯০ সালের ১০ই মার্চ শিবির চাকসু'র বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে আক্রমণ চালিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকেই শুধু অপমান করেনি, তাদের প্যান্ডেলগুলোও আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এনামুল হকের নেতৃত্বে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি দোষী ছাত্রদের চিহ্নিত করে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। তখন থেকেই ডঃ হকের উপর শিবিরের শ্যেন দৃষ্টি পড়ে, যদিও তিনি চট্টগ্রামের জিয়া পরিষদের সভাপতি। পরবর্তীতে তাকে যথারীতি সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোস্ট নিয়োগ করা হলে শিবির প্রভোস্ট হলে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং তাকে ব্যক্তিগতভাবে লাঞ্ছিতও করা হয়। বর্তমানে সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য নামক নাম সর্বস্ব যে সংগঠনটি আছে সেটির জন্ম হয় এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এবং তারাই নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন প্রভোস্ট ডঃ এনামুল হকের পদত্যাগসহ ৭ দফা দাবী জানায়। এর কর্মসূচী হিসেবে মিছিল ও ধর্মঘট পালন করে। ১৬ই আগস্ট ('৯০ইং) সিন্ডিকেটের সভা ২২ ঘন্টা ঘেরাও করে রাখে।

শিবিরের অত্যাচার এবং আক্রমণের সর্বশেষ ঘটনাটি ব্যাপক সহিংস আকারে ঘটে ২২শে ডিসেম্বর ('৯০ইংতে)। যার ফলে ফারুকুজ্জামান নামক একটি ছাত্র নিহত হয় এবং ১০/১৫ জন শিক্ষক আহত হয়।

ঐ দিন শিক্ষকদের অপরাধ কি ছিল? শিবির আহূত ধর্মঘট উপেক্ষা করে শিক্ষকদের একটি বৃহৎ অংশ ফ্যাকাল্টি ভবনে ঢুকতে চেয়েছিলেন। ফ্যাকাল্টি ভবন তাদের শুধু কর্মস্থল নয়, তাদের বসার জায়গা- বই-পুস্তক, চিঠিপত্র সংগ্রহের জায়গা এবং পরীক্ষার কাজকর্ম করার স্থানও বটে। ছাত্রদের যেমন ধর্মঘট ডাকার অধিকার আছে, তেমনি শিক্ষকদের কর্মস্থলে প্রবেশেরও অধিকার আছে। কর্তব্যকর্মে বাধা প্রদানের দায়ে ধর্মঘটী ছাত্ররা কেন দায়ী হবে না সে প্রশ্নটি সঙ্গতভাবেই সরকার এবং জনগণের কাছে রাখা যায়।

দুঃখজনকভাবে বলতে হয় যে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের একজন সম্মানিত বিচারপতি এ সমস্ত বাস্তব ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শকটটি তুলে ধরতে পারেননি। যদি উপরোক্ত ঘটনাবলীর জন্য শিবির দায়ী না হয়ে থাকে তাহলে ছাত্রদের অন্য কোন্ সংগঠনটি দায়ী ছিল তাও রিপোর্টে উল্লেখ থাকতে পারত। কিন্তু রিপোর্টেই উল্লেখ আছে যে, বিগত চাকসু নির্বাচনের পর থেকে শিবির বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের রাজত্ব (রিপোর্টের ভাষায় Reign of terror) কায়েম করে। সেই সন্ত্রাসের ফলে বার বার সিন্ডিকেট এবং ডিসিপ্লিনারী কমিটির সভাসমূহ ঘেরাও করা এবং উপাচার্যের অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়ার কাজটি যে শিবির করেছিল এবং সেটা যে গুরুতরভাবে বেআইনী কাজ সে সম্বন্ধে কোন মতামত প্রদান না করে তদন্ত কমিশন ঢালাওভাবে শিক্ষকদের ভেতরকার দলাদলি ও উপাচার্যের দক্ষতার অভাব এবংঅহমবোধ (Ego) দায়ী করেছে।

প্রথমেই শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলির অভিযোগটি ধরা যাক। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন অনেকটা অংশগ্রহণকারী বা গণতান্ত্রিক প্রশাসন। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন অংশে যথাঃ- সিন্ডিকেট, সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ফাইন্যান্স কমিটি, ফ্যাকাল্টি ইত্যাদিতে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেরণ কিংবা পূরণ করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন যেখানে আছে সেখানে দল থাকবে না বলা অনেকটা স্ববিরোধী এবং হাস্যকর। অথচ শুধু আলোচ্য তদন্ত রিপোর্টটিতে একজন বিচারপতিই নয়, এমনকি সরকারী নানা মহল থেকেও ব্যক্তিগতভাবে মাঝে-মধ্যে নানা কটূ কাটব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শুনতে হয়।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং তাদের প্রশাসন বহুলাংশে গণতান্ত্রিক। এর উদ্দেশ্য হল সরকারী আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রেখে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের স্বকীয়তা বজায় রাখা। মুক্ত এবং স্বাধীন পরিবেশ ছাড়া জ্ঞান এবং বুদ্ধির বিকাশ সম্ভব হয় না এবং সে কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় বিশের বিদ্যার যথার্থ আলয়ে পরিণত হতে পারে না। কোন স্বাধীনতাই এক তরফা বা নিরঙ্কুশ হতে পারে না। অধিকারের সঙ্গে দায়িত্ব পালনও ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। তাই শিক্ষকদেরও বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের আইন-কানুন মেনে চলতে হবে। সে ব্যাপারে শিক্ষকদের কোন দোষ-ত্রুটি হয়ে থাকলে তদন্ত কমিশন তা বিশেষভাবে চিহ্নিত করে সে ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সুপারিশ গ্রহণ করতে পারেন। পৃথিবীর অনেক দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোর্ট বা আদালতও আছে এসব ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। কিন্তু যে দেশে শিক্ষার হার ব্যাপকভাবে স্বল্প সে দেশের একটি উচ্চ শিক্ষিত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে পাইকারীভাবে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে রাজনীতি চর্চা থেকে বিরত করার জন্য সুপারিশ আইয়ুব-মোনেমী স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর দিনগুলোর কথাই মনে করে দেয়। তাঁদের এই মৌলিক গণতান্ত্রিক এবং মানবিক অধিকার হরণের পরামর্শটি একজন বিচারপতির কাছ থেকে আসায় ব্যাপারটি আরো বিস্ময়কর মনে হয়।

উপাচার্যের অদক্ষতা এবং অহমবোধের অভিযোগটিও বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতে কিন্তু শিবির ব্যক্তিগতভাবে উপাচার্যের বিরুদ্ধে ছিল না। উপাচার্যের বিরুদ্ধে তারা সক্রিয় হয়ে উঠে যখন পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে সাধারণ শিক্ষক এবং ছাত্রদের দাবীর ফলে উপাচার্যকে সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিয়ে বিভিন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করতে হয় এবং তদন্ত কমিটিগুলো শিবিরভুক্ত ছাত্রদের দায়ী করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে। ২২শে ডিসেম্বর ঘটনাবলীর আগে তাই শিবিরের বক্তব্য এবং বিবৃতিগুলো পড়লে দেখা যাবে যে তারা তাদের দলের ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসমূহ প্রত্যাহার করার দাবী জানাচ্ছে।

উপাচার্য আলমগীর সিরাজুদ্দিনের